বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুন্ডলা ক্ষুন্ন প্রশ্নবোধক পরিসমাপ্তির শিল্পশৈলী

শোহিনি ভট্টাচার্য

অ্যাসিস্তেন্ত প্রফেসর, স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগ, বেথুন মহাবিদ্যালয়

বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুন্ডলা" উপন্যাসের শেষকথা --

'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আওৌলিত হইতে হইতে কপালকুন্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?' বঙ্কিমের অন্য কোনো উপন্যাসই এভাবে শেষ হয়নি। সাধারণভাবে 'তাহারা সুখে তীবন কাতাইতে লাগিল...'- অতীয় পরিসমাপ্তিই তিনি পছণ্ড করতেন, যেখানে পাঠকের আর কোনো তিজ্ঞাসা থাকবে না। তাহলে কেন এই বিশেষ উপন্যাসতি '?'- চিহ্ন দিয়ে শেষ হল? এই প্রশ্নচিহ্নের শিল্পসার্থকতার প্রশ্নেই আমাদের বর্তমান আলোচনা।

অশেষের ব্যঞ্জনাময় উত্তরহীন এক প্রশ্নব্যাকুলতায় উপন্যাসের open ending হল আধুনিক উপন্যাসের লক্ষণ। আলোচ্য উপন্যাসের মোত আততি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমের তীবদ্দশায়। পরিশেষের তিজ্ঞাসাচিহ্নিত এই অশেষ কথাতি তপন্যাসিকের বহু দিনের চিন্তার ফসল।

'কপালকুন্ডলা'য় বর্ণিত ঘতনাধারায় নিয়তিবাদ বা 'fatalism' যে প্রাধান্য পেয়েছে -- একথা স্বয়ং বঙ্কিম স্বীকার করেছেন। অদৃষ্টের গতি ও অনিবার্যতা সংক্রান্ত একতি ব্যাখ্যামূলক অংশ উপন্যাসের ১ম সংস্করণে, চতুর্থ খন্ড-এর ১ম পরিচ্ছেদের সূচনায় লেখক 'গ্রন্থখন্ডারম্ভে' শীর্ষনামে যুক্ত করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা বর্তিত হয়। ৬ষ্ঠ সংস্করণ থেকে লেখক এতি পরিত্যাগ করে, চতুর্থখন্ডের ২য় পরিচ্ছেদতিকেই ১ম পরিচ্ছেদ হিসেবে প্রকাশ করেন। উপন্যাসের মূল আখ্যানের সঙ্গে উক্ত অংশের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকায় লেখক অংশতি বর্তন করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু তাতে তপন্যাসিকের নিতস্ব অভিমত ব্যক্ত হওয়ায় বর্তিত পরিচ্ছেদের গুরুত্ব এখনও রয়ে গেছে। পরিচ্ছেদের সূচনায়, দার্শনিক মিল-এর একতি বক্তব্য তিনি উঙার করেছেন, যার মূল কথা-

"our actions do not depend upon our desires, whatever our wishes may be a superior power or an abstract destiny will overrull them and compel us to act, not as we desire, but in the manner predestined.'

পরে, পরিচ্ছেদমধ্যে লেখক নিতের ভাষ্যে এই অভিমতকে সমর্থন তনিয়েছেন। উপন্যাসতির আদ্যন্ত বিশ্লেষণেও আমরা দেখতে পাই, 'কপালকুন্ডলা'য় অদৃষ্ট বা অনৈসর্গিক শক্তির প্রভাব সর্বত্র ক্রিয়াশীল থেকেছে। নবকুমারকে অবলম্বন করে কাহিনি পরিকল্পিত হলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ ছিল অন্যত্র। তিনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ত্র্যাতেডি-বৃত্ত রচনা করতে চান নি। আর ঠিক সেই কারণেই, নবকুমার কিংবা কপালকুন্ডলা চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রয়াসী হননি বঙ্কিম। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত বাতাবরণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে fatalism বা নিয়তি। এই দুর্জ্ঞেয় শক্তির হাতে মানবের ভাগ্য-বিপর্যয়ই 'কপালকুন্ডলা' উপন্যাসের ত্র্যাতেডির মূল সুর। বলা বাহুল্য, উপন্যাসের শেষকালে 'কোথায় গেল?' -খন্ডবাক্যে যে অনন্ত তিজ্ঞাসা পাঠক-হৃদয়ে তীব্র দহনত্বালা ও কৌতূহল সৃষ্টি করে, তা উপন্যাসের মূল সুরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

উপন্যাসতির প্রতিতি সংস্করণেই বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ও বর্ণনারীতি বেশ কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্তন করেছেন। তবে, দুতি পরিবর্তন ঘতেছে চতুর্থ খন্ড-এ। পরিমার্তিত পাঠে এই খন্ডে রয়েছে ৯তি পরিচ্ছেদ; শেষ পরিচ্ছেদের নাম 'প্রেতভূমে'। ১ম সংস্করণের চতুর্থ খন্ডের ভূমিকায় বর্তিত পরিচ্ছেদে বঙ্কিম বলেছিলেন--

'অদৃষ্টের তাৎপর্য যে কোন দৈব বা অনৈসর্গিক শক্তিতে অস্মাদাদির কার্য সকলকে গতি বিশেষ প্রাপ্ত করায়, এমন আমি বলিতেছি না। অনীশ্বরবাদীও অদৃষ্ট স্বীকার করিতে পারেন।... কোন কোন পাঠক এ গ্রন্থ শেষ পাঠ করিয়া ক্ষুন্ন হইতে পারেন। বলিতে পারেন, 'এরূপ সমাপ্তি সুখের হইল না; গ্রন্থকার অন্যরূপ করিতে পারিতেন।' ইহার উত্তর-- 'অদৃষ্টের গতি'। অদৃষ্ট কে খন্ডাইতে পারে? গ্রন্থকারের সাধ্য নহে। গ্রন্থারম্ভে যেখানে যে বীতবপন হইয়াছে, সেইখানে সেই বীত্তের ফল ফলিবে।'

বঙ্কিম পরবর্তীকালে 'গ্রন্থখন্ডারম্ভে' অংশতি বাদ দিয়ে পরবর্তী পরিচ্ছেদ থেকে অর্থাৎ 'শয়নাগারে' থেকে চতুর্থখন্ডের কাহিনি শুরু করেছেন। কপালকুন্ডলার তীবনে নিয়তির প্রভাব নির্ধারণে বর্তিত পরিচ্ছেদতির গুরুত্বছিল-- এ কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, অদৃষ্টশক্তি সম্পর্কে তপন্যাসিকের এমন গদ্যাত্মক বিশ্লেষণ পাঠকের কাততাকে অনেক সহতকরে দিত এবং সেই সঙ্গে উপন্যাসের সার্থকতাও অনেকখানি ক্ষুন্ন হত। বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন যে, উপন্যাসে ব্যক্ত ঘতনাধারনাতিই তাঁর ব্যক্তিক নিয়তিবাদী দর্শন তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট। তাই এই অংশ বর্তন করলে উপন্যাসের রসাস্বাদন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে নিঃসণ্ডেহে।

আগেই বলেছি, বঙ্কিম তাঁর তীবৎকালে এই উপন্যাসের মোত ৮তি সংস্করণ দেখে যেতে পেরেছিলেন। ৬ষ্ঠ সংস্করণ থেকেই শুরু হয় প্রচলিত পরিসমাপ্ত। এর পূর্বে, ১ম থেকে ৩য় সংস্করণ পর্যন্ত একতি এবং ৪র্থ থেকে ৫ম সংস্করণ পর্যন্ত আর একতি পাঠে উপন্যাসতি পরিসমাপ্ত হতে দেখা যায়। পাঠগুলির পরিবর্তন লক্ষ করলেই প্রচলিত পাঠের '?'- চিহ্নের শিল্পসার্থকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।--

ত ১ম, ২য় ও ৩য় সংস্করণের পাঠে উপন্যাসের সমাপ্তি--

'কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাহারা বাতী প্রত্যাগমন করিলেন কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণের পরে তলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল, দেখিলেন - বোধ হইল যেন মনুষ্য মস্তক, মনুষ্য হস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন

এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন, কপালকুন্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্য বিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবমাত্র নিঃশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল 'মৃন্ময়ি মন্ময়ি!'

--নবকুমারের এই শোকোচ্ছ্বাসেই উপন্যাসতি শেষ হয়েছিল। উপন্যাসের শেষদৃশ্যে এসে এখানে আমরা কাপালিককে অনেক কর্মতৎপর দেখলাম। কপালকুন্ডলাকে সমুদ্রে অন্তর্হিত হতে দেখে নবকুমারও সমুদ্রে লাফিয়ে পড়েন এবং কাপালিক তাঁকে উঙার করেন। এক্ষেত্রে, কপালকুন্ডলার মৃত্যুতে নবকুমারের ত্র্যাত্তেডি আরও মর্মন্তুদ হয়ে উঠেছিল; হয়তো বা পদ্মাবতীর ফিরে আসারও সম্ভাবনা থাকতে পারতো। হঠাৎই লেখকের মনে হয়েছে, কাহিনির এই পরিণামের সঙ্গে তাঁর বলা বক্তব্যের কোথাও একতা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। কেননা, চতুর্থ খন্ডের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে বঙ্কিম ত্রনিয়েছিলেন, কাপালিক যখন শিখরচ্যুত হয়ে পড়ে যান, তখন তাঁর হাত দুতো ভেঙে যায়। নবকুমারের কাছে তিনি স্বীকারও করেছেন, 'এই বাহুদ্বয়ে শিশুর বলও নাই'। তাহলে তাঁর পক্ষে হাত দিয়ে নবকুমারের অচৈতন্য দেহ উঙার করে আনা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এই অসঙ্গতিপূর্ণ পরিসমাপ্তি ৩য় সংস্করণেরও বত্তয় ছিল।

ত৪র্থ ও ৫ম সংস্করণের পাঠে উপন্যাসের সমাপ্তি--

'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আওৌলিত হইতে হইতে কপালকুন্ডলা ও নবকুমার প্রাণত্যাগ করিলেন।'

--নবকুমারের শোকোচ্ছ্বাস এবার বর্তন তো হলই, প্রবণতানুযায়ী সমাপ্তিতে শেষকথাও বলে দিলেন বঙ্কিম। বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনে কাপালিকের উঙার প্রসঙ্গতিও বর্তিত হল।

তাহলে, পরবর্তী ৬ষ্ঠ সংস্করণে অর্থাৎ প্রচলিত পাঠে হঠাৎ কেন আবির্ভূত হল '?' - চিহ্ন?

৩৬ষ্ঠ সংস্করণে পাঠে উপন্যাসের সমাপ্তি--

'সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্তবায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আওৌলিত হইতে হইতে কপালকুন্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?'

উনিশ শতকের তপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর অসামান্য শিল্পকুশলতায় কিছু কিছু তায়গায় নিতেকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এ উপন্যাসের শেষবাক্যে ব্যবহৃত '?'- চিহ্নতির অশেষ ব্যঞ্জনা বঙ্কিমের আধুনিক মননের পরিচায়ক। এ '?' -চিহ্ন যেন নবকুমার, পাঠক তপন্যাসিক সকলের দীর্ঘশ্বাস--আরণ্যক সৌওর্য কি নিমজ্জিত হল সমুদ্রগর্ভে? কপালকুন্ডলার বন্যদেবীমূর্তিকে প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন--

'কপালকুন্ডলা নিসর্গকন্যা নয়, মূর্তিমতী নিসর্গ, spirit of nature'।

নারীরূপ যে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়--সে বিশ্বসৌওর্যের অংশীভূত, বিশ্বপ্রকৃতির মতো রহস্যময়, একথা এই উপন্যাসেই প্রথম ত্রনা গেল কপালকুন্ডলার চরিত্রায়নে। কপালকুন্ডলা মহামায়ার অংশ, আর নবকুমার মায়াভিভূত ত্রীব-এরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। উনিশ শতকীয় নব্য রোমান্তিক রূপতৃষত্রয় নিমজ্জিত বাঙালি নায়কের 'নবকুমার' নামকরণতি এখানে লক্ষণীয়। কপালকুন্ডলার ত্রীবন যেন দিগন্তবিস্তারী বন্ধনহীন সমুদ্র আর অরণ্যের মূলীভূত রূপ। এই অধরা মুক্তির আর্তির দ্যোতনাও পাওয়া যায় সমাপ্তির '?'-চিহ্নে।

Wordsworth - এর লুসির মতোই এই প্রকৃতিকন্যা মুক্ত প্রকৃতির প্রতীক। আকণ্ঠ মুক্তি পিপাসার আর্তি নিয়েই ত্রীবনের অনিবার্যতাকেই তিনি বরণ করেছিলেন। অরণ্যত্রীবনে কাপালিকের বন্ধন থেকে তিনি যেমন মুক্তি চেয়েছিলেন, দাম্পত্যত্রীবনেও তেমনই নবকুমারের বন্ধন থেকে মুক্তি চেয়েছিলেন। পদে পদে লৌকিক প্রথাগত বন্ধনের সঙ্গে তাঁর স্বাধীন আরণ্যকসত্তার দ্বৈরথ দেখা গেছে। অবশেষে, বিধিলিপি লঙ্ঘনত্রনিত অপরাধবোধে পীড়িত হয়ে আত্মবিসর্তনের মাধ্যমে মুক্তি পেতে মৃত্যুর পথ বেছে নেন তিনি। অলংকার বন্ধনের চিহ্ন-- সমাত্রবন্ধনে আবঙ নন বলেই মন্ময়ী আদ্যন্ত অলংকারবিমুখ। বঙ্কিম-উপন্যাসের একতন মধ্যাযুগীয় বিবাহিতা ভারতীয় নারী হয়েও তাঁর দুঃসাহসিক উচ্চারণ-- 'যদি ত্রনিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' আত্রীবন বন্য প্রকৃতির মতোই তাঁর কেশরাশি উন্মুক্ত ছিল। বৈবাহিক ত্রীবনে শ্যামা মৃন্ময়ীর অবঙ ঘন কেশরাশিকে সাংসারিক বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু মৃন্ময়ী মৃত্যুর আগে তাঁর বঙ কবরী খুলে সেই আরণ্যক মুক্তির মধ্যেই তাঁর উন্মুক্ত কেশভারকে এলায়িত করে দিয়েছেন। সংসারের প্রতি এমন তদাসীন্য, বঙ আবেষ্টনী ছিন্ন করার স্বাধীনতাস্পৃহা বঙ্কিমসাহিত্যে একমাত্র কপালকুন্ডলার চরিত্রেই পাওয়া যায়। তিনিই বলতে পারেন-- 'আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব'। লক্ষণীয়, সমুদ্রতীরের অস্ফুত সন্ধ্যালোকে যে নারীাক প্রথম স্থাপন করা হয়েছিল, উপন্যাসের শেষ পরিচ্ছেদে রাত্রিকালে গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জন পর্যন্ত দীর্ঘ এক বছর তিন মাসের ত্রীবনবৃত্তে তাঁকে আমরা একবারও প্রকাশ্য দিবালোকে দেখতে পাইনা; এমনকি বিয়ের পরেও রাত্রি ছাড়া আমরা তাঁকে দেখতে পাইনা। তাঁর রূপ রহস্যাবৃত; ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন চুলে আবৃত। রোম্যান্তিক কবিদের মতোই সে সৌওর্য অধরা থেকে গেছে স্বামী নবকুমারের কাছে। তাই বলা যায়, এক অপ্রাকৃত চিরকাঙ্ক্ষিত অধরা সৌওর্যলোকের প্রতি মর্ত্যমানুষের আকর্ষণের চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতার রহস্য ফুতে উঠেছে ৬ষ্ঠ সংস্করণের পরিসমাপ্তির প্রশ্নবোধক তিজ্ঞাসাচিহ্নে।

মৃত্যুর আগে নবকুমার তেনেছিলেন, মৃন্ময়ীর প্রতি তাঁর সংশয় ছিল মিথ্যা। তাই মৃন্ময়ীহীন ত্রীবন তাঁর কাছে নিরর্থক। পরিমার্তিত সংস্করণে একতি বাক্যে কপাকুন্ডলা ও নবকুমারের ভেসে যাওয়ার তথ্য পরিবেশনে তাঁদের ত্রীবননাত্যের আকস্মিক যবনিকাপাত হয়েছে; নায়ক-নায়িকার পরিণতি নিয়তির অভিমুখেই যাত্রা করেছে। ঘতনার এই নাতকীয়, আকর্ষণীয়, আকস্মিক পরিণতি পাঠকচিত্তকে অতর্কিত আঘাতে স্তব্ধ করে দেয়। উপন্যাসের ত্র্যাত্তিক পরিণতি হয়ে ওঠে গভীরতর ব্যঞ্জনাবহ।

তথ্যসূত্র ঃ

কপালকুণ্ডলা, বঙ্কিম রচনাবলি - প্রথম খন্ড; প্রথম পাত্র'ত সংস্করন আষাঢ় ১৩৯০